অভিনব গোয়েন্দানী নারায়ণী

অদ্রীশ বর্ধন

সরীসৃপ বর্মা খুব একটি বিরাট ক্রিমিন্যাল নয়। মাই ডিয়ার টাইপের লোকও নয়। একেবারে ফ্যালনাও নয়। কেননা, নারায়ণী সেনার প্রথম শিকার হতে হয়েছিল তাকেই। নারায়ণী সেনার সংগঠক একজন মহিলা। বয়স সতেরো থেকে সাতাশের মধ্যে। শরীরী বিদ্যুৎ বলা যায়। মাস কয়েকের মধ্যেই এই সংগঠন গোটা কলকাতার নিচের মহলে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল।

নারায়ণী সেনার কারও অন্তরে দয়ামায়া নেই। পালের গোদা মেয়েটার মতই প্রত্যেকে নিষ্ঠুর। মেয়েটি আর এক কাঠি ওপরে যায়। ভয়ঙ্কর বেপরোয়া। ব্রেনখানা ক্ষুরের মত ধারালো।

আইনকে আগলে রাখার জন্যেই তার আবির্ভাব, অথচ সে নিজে থাকে আইনের বাইরে, এমন একটা সময় এসেছিল যখন নারায়ণীর নাম শুনলেই অন্ধকার মহলের মানুষ আঁতকে উঠত। নামহীন আতঙ্কে বুক ঢিপ ঢিপ করত। মার্কামারা ডাকাবুকো মানুষও রাতের অ্যাডভেঞ্চার শেষ করে গভীর নিশীথে বাড়ি ফিরে যখন দেখত, দরজায় খড়ি দিয়ে আঁকা রয়েছে অদ্ভুত একটি মেয়েলী মূর্তি—ধাত ছেড়ে যেত তার সঙ্গে সঙ্গে। ছিটকে সরে যেত দরজার সামনে থেকে। উল্টোদিকের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ফস্ করে পকেট থেকে টেনে বের করত কালো অটোমেটিক, হিমশীতল বিভীষিকার স্রোত নেমে যেত শিরদাঁড়া বেয়ে। কিন্তু সরীসৃপ বর্মাকে কুপোকাৎ করার সময়ে নারায়ণীর নাম এতটা ছড়ায়নি। সেই শুরু। তার পর থেকেই সে শরীরী তামসী হয়ে দাঁড়ায় কলকাতার ক্রিমিনালদের কাছে। প্রতিটি সমাজশত্রু তাকে মনে করত ভয়ানক এক অপার্থিব আতঙ্ক। অথচ ছিলছিলে চেহারার ভারি সুন্দর এই মেয়েটিকে দেখলে পুলকিত হয় না, এমন পুরুষও বিরল।

শ্রীযুক্ত সরীসৃপ বর্মা খুব ঢ্যাঙা পুরুষ, অবিশ্বাসী রকমের রোগা। জ্যান্ত মমি বললেও চলে। চামড়া দিয়ে মোড়া একটা চলমান কঙ্কাল। চুল বেজায় কালো এবং বিলক্ষণ তেলচকচকে। বুরুশ দিয়ে টেনে আঁচড়ে পরিপাটি রাখা হয় অষ্টপ্রহর। করোটি ফুটবলের মত গোল। এবং ছোট্ট তৈলমসৃণ ভঙ্গিমায় হাঁটবার সময়ে ঘাড়ের সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখে গোল মুণ্ডুকে। লিকলিকে এহেন বপুর সঙ্গে ম্যাচ করিয়ে ভগবান দিয়েছেন এমন একজোড়া চোখ যা কয়লার মত কালো অথচ ভাবলেশহীন। পিচ্ছিল চলাফেরা আর চকচকে পুঁতির মত চোখ থাকে আর একটি প্রাণীর। তার নাম সাপ. এইসব কারণেই তালঢ্যাঙা এই লোকটাকে সরীসৃপবর্মা বলে ডাকা হয়।

রেসের মাঠে একটা কুখ্যাত গ্যাং-এর সে সর্দার। খিদিরপুরের ফ্যানসি মার্কেট পর্যন্ত তার এলাকা। ঘোড়ার ল্যাজ ধরে মোটা দাঁও পিটলে রকমারি ফিকিরে সে তাদের ব্ল্যাকমেল করে। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে যারা বিদেশী জিনিস কিনে কালো টাকা ওড়ায়—তাদেরও দোহন করে অদ্ভুত অদ্ভুত পন্থায়। দরকার হলে মারধরও করে। এছাড়াও আরও অনেক কুকর্মে সে হাত পাকিয়েছে। সেসব একটু একটু করে জানা যাবে।

নারায়ণীর নজরে সে পড়েছিল এই ময়দানেই। সঞ্জয় কর্মকারকে বেধড়ক পিটিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছিল তার টাকাকড়ি। সঞ্জয় বেকার গ্র্যাজুয়েট। মা-বাবা নেই, ভাই-বোন নেই। হিংস্র পিসীর কাছ থেকে পাঁচশ টাকা ধার নিয়ে মহাজনের কারবার ফেঁদেছিল। কৃষ্ণনগর থেকে মাটির মূর্তি কিনত জলের দামে। রেসুড়েদের কাছে বেচত চড়া দামে। তাতে তার বেশ দু-পয়সা আসছিল। কিন্তু সরীসৃপ বর্মা আর তার দলবলের তা সহ্য হল না। তাই সঞ্জয়কে উত্তম মধ্যম দিয়ে কেড়ে নিল সমস্ত টাকা, আছড়ে আছড়ে ভাঙল মাটির মূর্তিগুলোকে।

তখন সবে সন্ধ্যে হচ্ছে। দূরে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দেখল নারায়ণী। শখ করে ঘোড়দৌড় দেখতে সেদিনই সে এসেছিল রেসের মাঠে।

সঞ্জয়ের পুরো তবিল কেড়ে নিয়ে চ্যালাচামুণ্ডা সমেত সরীসৃপ গেল একটা ঠাণ্ডা ঘরে। মদ-টদ খেয়ে ট্যাক্সি নিয়ে গেল শিয়ালদা স্টেশনে। চেপে বসল ব্যারাকপুরের ট্রেনে। একই কামরায় উঠল নারায়ণীও।

তখন রাত দশটা। সরীসৃপের কপাল খারাপ। তাই সেদিন এই কামরায় লোকজন তেমন ওঠেনি। টিটাগড়ের পর কামরা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। জানলার ধারে বসে থাকা পরমাসুন্দরীটিকে চোখ দিয়ে আরও গিলে গিলে খেতে লাগল সরীসৃপ আর চার চ্যালা।

সুন্দরী কিন্তু তাকিয়ে রয়েছে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে। হাওয়ায় তার ঘাড়ছাঁটা চুল উড়ছে। সে অপরূপা—কিন্তু তার বেশবাস পুরুষঘেঁষা। গায়ে চিকনের হলুদ পাঞ্জাবী আর পায়ে জয়পুরী চপ্পল। সিল্কের পাজামা কামড়ে রয়েছে উরু আর পায়ের ডিম। পাশের বেঞ্চিতে রেখেছে বাহারি রাজস্থানী ব্যাগ। একরতি সোনাদানা নেই তার শ্রীঅঙ্গে। যৌবনবতীদের আভরণ আর প্রসাধনের দরকার হয় না। এই রূপবতীরও ঠোঁটে নেই লিপস্টিক, মুখে নেই পাউডার। মুখ তার ধবধবে সাদা, দুরন্ত রক্তের আভায় ঠোঁট লালচে।

সর্পচক্ষু মেলে নিমেষে উর্বশী-রূপ পান করে বোধহয় মাতাল হয়েছিল সরীসৃপ বর্মা। তার চার সঙ্গীর অবস্থাও তথৈবচ।

সুন্দরী কিন্তু নির্বিকার। ট্রেন ছুটছে। কামরা দুলছে। তার অনন্য বরতনুও দুলে দুলে উঠছে। কিন্তু তপস্বিনীর মতই চোখ কুঁচকে আপন মনে কি যেন ভাবছে। পাঁচ জোড়া লোলুপ চোখের লালসা যেন তাকে স্পর্শও করছে না। সব মেয়েরাই এই ব্যাপারে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা রাখে। পিঠের পেছনে কেউ ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকলে হয় বুকের আঁচল টানে, নয়তো ঘাড়টাকে একটু ঘুরিয়ে আড়চোখে দেখে নেয়।

কিন্তু রাতের এই রূপসীর কোনোদিকে খেয়াল নেই। কুঁচকোনো চোখের ওপর চুল এসে পড়ায় একবার হাত তুলে চুল সরিয়ে নিল। তারপর রাজস্থানী ব্যাগটা পাশ থেকে তুলে কোলের ওপর রাখল। মোম-সাদা আঙুল দিয়ে বের করে আনল একতাড়া একশ টাকার নোট। আবার ঢুকিয়ে রাখল ব্যাগে। চেয়ে রইল জানলা দিয়ে বাইরে।

এ সুযোগ কি ছাড়া যায়?

উঠে দাঁড়াল সরীসৃপ। চার সঙ্গীকে কিছু বলার দরকার হয়নি। তাদের সারা শরীর তখন শিরশির করছে রূপ আর আকর্ষণে।

অনন্যার সামনে গিয়ে বললে সরীসৃপ—কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

স্বপ্ন-ছাওয়া দুই চোখ আর হিমশীতল দুই চোখের মিলন ঘটল ঠিক তখুনি। এতক্ষণ যেন স্বপ্নের জগতে বিচরণ করছিল সুন্দরী। স্বপ্নের ঘোর লেগে রয়েছে স্নিগ্ধ দুই মণিকায়। মণি দুটো কিন্তু কালো নয়—পিঙ্গল বর্ণ। অকারণেই বুকটা ধক্ করে ওঠে সরীসৃপের। কৃষ্ণনয়নাদের তবুও বোঝা যায়—কিন্তু পিঙ্গলচক্ষু সুন্দরীরা প্রত্যেকেই এক-একটা জীবন্ত প্রহেলিকা। অন্তত সরীসৃপের সেই অভিজ্ঞতা।

সেই অভিজ্ঞতা আর একটু বাড়ল এর পরের ঘটনায়।

পিঙ্গলচক্ষু থেকে স্বপ্নের আভাস মিলিয়ে গেল একটু একটু করে। এখন তা গ্র্যানাইট পাথরের মত কঠিন। একটু আগেও যা ছিল স্নিগ্ধ সুন্দর—এখন তা নির্মম ভয়ঙ্কর।

অথচ গহন গভীর হাসি খেলছে সুন্দরীর অজন্তা অধরে। ফুরফুরে প্রজাপতি যেন ডানা নেড়ে উঠল কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে।

সে বললে—"জাহান্নমে।"

এই বলে পেলব হাত ঢোকালো রাজস্থানী ব্যাগের মধ্যে···

চকিতে টান টান হয়ে গেল সরীসৃপের পায়ের পেশী থেকে মাথার ঘিলু পর্যন্ত···

হাত বের করে আনল সুন্দরী। হাতে একটা সোনার সিগারেট কেস।

পারফেক্টলি গোল হয়ে গেল সরীসৃপের পুঁতি চক্ষু। এরকম সরেস সুন্দরীকে আর তো ছাড়া যায় না।

উঠে দাঁড়াল সুন্দরী। মাথায় সে পাঁচ ফুটের বেশি নয়। তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা কিন্তু পাঁচজনেই কমবেশি ছ-ফুট করে লম্বা। হরেদরে তিরিশ ফুট হাইটের সঙ্গে লড়তে হবে তন্বী পাঁচ ফুটকে। পেশির আর কাঁধের মোট যোগফলও হেলাফেলার ব্যাপার নয়। পাঁচজনেরই চোখে লকলক করছে আদিম ক্ষুধা···

ধীরেসুস্থে জানলার গায়ে ঠেসান দিয়ে রাখা সুদৃশ্য ছোট ছাতাটা তুলে নিল পিঙ্গলচক্ষু রহস্যময়ী। হাতলটা সোনা দিয়ে বাঁধানো। লড়াই কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি চলেনি। পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই টলতে টলতে নেমে এসেছিল পাঁচ মূর্তি। প্রত্যেকেই বিধ্বস্ত, রক্তাক্ত। একজন কুলি সেই দেখে চটজলদি হাজির করল এক বালতি জল। পুলিশ ইন্সপেক্টর সম্রাট সরকার হেলেদুলে এগিয়ে এসে ভারি গলায় বললে—"আজকে দেখছি উল্টো খেল?"

সরীসৃপের একটা চোখ ঘিরে কালসিটের

নয়। পুঁতি-চক্ষু প্রায় অদৃশ্য। অন্য চোখমেলে কটমট করে তাকিয়ে সে বললে—"মদানি না ডাইনি!"
"ডাকাতনি," বললে তার এক সঙ্গী। এর কনুই-এর হাড় খুলে গেছে।
চোখ নাচিয়ে বললে সম্রাট সরকার "ব্যাপারটা কী?"
"রূপসী বোম্বেটে। আজকের রোজগারটাই কেড়ে নিয়ে গেল,"সরীসৃপ এখন সাপের মতই ফোঁস ফোঁস করছে।
চোখ ছোট হয়ে গেল সম্রাট সরকারের। পুলিশে কাজ করলেও সমাজশত্রুদের সঙ্গে তাকে হাত মিলিয়ে চলতে হয়। বখরার ব্যাপারটাও আছে। নইলে এত রাতে প্ল্যাটফর্মে থাকবে কেন?
বললে—"এ লাইনে?"
হ্যাঁ এ লাইনে—এই প্রথম দেখলাম। ছুঁড়িটাকে ক্যাপচার করতেই হবে গুরু।
গুরু অর্থাৎ পুলিশ-প্রবর ঠোঁট কামড়ে ধরেই ছেড়ে দিল। বললে —আজকের কমিশনটা তাহলে গেল?
খেঁকিয়ে উঠল সরীসৃপ—মেরে দিল্-কে গ্যারেজে পুরুন আগে,সুদে আসলে উশুল করে নেব। উফ! একটা দাঁতও যে নড়ছে, এতক্ষণে তা খেয়াল হয়েছে সরীসৃপের।
"হুম।"রাসভারি হয়ে গেল সম্রাট সরকার—"দেখতে কিরকম?"
"বিউটি! দেখুন, যদি বুঝতে পারেন"বলে একটা খাম এগিয়ে দিল সরীসৃপ।
দামী কাগজের লেফাপা। হাতে নিল সম্রাট সরকার।
"কে দিয়েছে?"
"হারামজাদি দিয়ে গেল যাবার সময়ে। খুলেই দেখুন না।"
খামের মুখ খোলাই ছিল। ভেতর থেকে এক তা কাগজ টেনে বের করল সম্রাট সরকার। শুধু একটা কাগজ আর কিছু লেখা নেই। শুধু একটা লাইন দিয়ে আঁকা ছবি রয়েছে। তন্বী শিখরদশনা এক নারীমূর্তি নিতম্ব আর পীবর বক্ষ দুলিয়ে নাচের ভঙ্গীমায় কটাক্ষ হানছে ঘাড় কাৎ করে।
ঘড়ঘড়ে গলায় বললে সম্রাট সরকার—"ছবি ভালই। কিন্তু এনিয়ে আমার কচুপোড়া হবে। বড্ড বেশি ডিটেকটিভ বই পড়ছিস আজকাল, তাই না? চামচিকে কোথাকার!"

॥ দুই ॥

দেবরের সামনে দাঁড়িয়ে হাসিভরা পিঙ্গল চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে নারায়ণী। ধূর্ত হাসির শিহর ছটফটিয়ে উঠছে সেখানে। নিবিড় প্রসন্নতা টলমল করছে রক্তাভ অধরের প্রান্তে। সবকিছুর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে একটা চাপা দুষ্টুমি, একটা ভয়ানক নষ্টামি, একটা অদ্ভুত কৌতুকবোধ। রঙ্গ ব্যঙ্গ সে ভালবাসে। তাই বুঝি ভাগ্য তার ঘাড় ধরে নামিয়েছে এই অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চারের অভিসারে পৃথিবীর পথের ওপর।
বছর কয়েক আগেও নিজেকে এই পজিশনে কল্পনাও করতে পারেনি নারায়ণী। সৎ-দিদির আশ্রয়ে হেঁসেল ঠেলেছে। জামাইবাবু মানুষটি কিন্তু ভালো। টানাটানির সংসারে শালীকে মুখনাড়া দিলেও উদ্বেগের মধ্যে ছিল, তার বিয়ে দিতে পারছে না বলে। এই সময়ে তার দিদি মরল বিষ খেয়ে। ছোট্ট চিরকুটে লিখে গেল মনের কথা—নারায়ণীকে তোমার পায়ে রেখে গেলাম।
নারায়ণী কিন্তু কারও পায়ের কাছে থাকবার জন্যে জন্মায়নি,দুদিন পরেই ভোররাতে সে-ও একটা চিরকুট লিখে রেখে উধাও হয়ে গেল। এক লাইনে লিখে গেছে : আবার দেখা হবে! না, এখনও দেখা হয়নি। তবে এবার দেখা হবে। জামাইবাবুর সব খবরই সে রাখে।
এই মুহূর্তে নারায়ণীর সাজানো গোছানো এই ঘরখানা দেখলে কিন্তু তাক লেগে যেত জামাইবাবুর। সাহেবপাড়ায় এ ধরনের নিরালা বাড়ি চট করে মেলে না। সাহেবদের তৈরি দোতলা বাড়ি। সামনে লন। মালি নেই বলে ঘাস হাঁটু-সমান লম্বা হয়েছে। রাস্তার ধারে উঁচু পাঁচিল। তাই রাস্তা থেকে এ-বাড়ি দেখা যায় না। মোটা থামগুলোর মধ্যেই যেন আজও লেপটে রয়েছে খাঁটি বৃটিশ মেজাজ।
দোতলার এই ঘরটাকে মনের মত সাজিয়েছে নারায়ণী। নিজের বড়লোকি রুচিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে ঘরের সব জায়গায়। মহীশূর থেকে আনিয়েছে চন্দন কাঠের কাজ, জয়পুর থেকে মীনাকরা শিল্পসামগ্রী, উড়িষ্যার ফিলিগ্রি, মুর্শিদাবাদের আইভরি। বার্মার ল্যাকার, পাঞ্জাবের কামানগিরি, কাশ্মীরের ল্যাটিস ওয়ার্কও ছড়াছড়ি যাচ্ছে ঘরময়। নেপাল আর তিব্বত থেকে এসেছে কিম্ভূত কারুকাজ।
ঘরের তিনদিকের রঙিন ধনুক জানলা দিয়ে অনেকগুলো রামধনু আলো এসে ঝলমল করে এই সব জিনিসের ওপর। রঙিন রোদের সবচেয়ে ঝলমলে খেলা দেখা যায় সকালে আর বিকালে—পূবের আর পশ্চিমের জানলা দিয়ে রঙিন কিরণ লুটোপুটি খায় হরেক সংগ্রহের ওপর।
রোদ পৌঁছোয় না কেবল একটা দেওয়ালে। উত্তরদিকের দেওয়ালে। এই দেওয়ালে শুধু একটা ব্ল্যাকবোর্ড। তাতে খড়ি দিয়ে আঁকা একটা উদ্ভট নারীমূর্তি—ঘাড় বেঁকিয়ে যেন কটাক্ষ হানছে নাগিনী-নৃত্য ভঙ্গীমায় দুষ্টুমি ঝলসাচ্ছে দুরন্ত চোখ আর পুরন্ত ঠোঁটে।
এই ছবির নিচেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছিল নারায়ণী। পূবের রঙিন রোদ এখন রামধনু হিল্লোল তুলেছে তার ধবধবে সাদা চামড়ায়। মিটিমিটি হাসছিল আজব অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় বুঁদ হয়ে গিয়ে। এত ঐশ্বর্যের মধ্যে সাহেবপাড়ার এই নিরালা বাড়িতে থাকবার কথা আগে সে ভাবেনি। কিন্তু এখন ভাবতে হচ্ছে। ক্ষমতায় না কুলোলেও চোখ-ধাঁধানো পরিবেশে তাকে থাকতেই হবে। টাকার অভাব ছিল, আছে, থাকবে—সুতরাং তা নিয়ে আর উদ্বেগে মনমরা হয়ে থাকে না।
হেসে নাও—দুদিন বই তো নয়—এই তার 'মটো'। এই পৃথিবীটায় হাসি ফুটোতেই তার জন্ম হয়েছে—বহু মুখে হাসি এনে দেবে সে—বিনিময়ে তাকেও আরামে থাকতে দিতে হবে। চমক,চেহারার ঝলক দেখানোর জন্যে যা-যা দরকার সবই আদায় করে নিতে হবে। এতদিন হা-পিত্যেশ করে বসে থেকেও তা পাওয়া যায়নি। জাঁকিয়ে বসার সময় হয়েছে, এটা বুঝতে পেরেই নারায়ণী জুটিয়ে নিয়েছে সাহেব পাড়ার এই বাড়িখানা।
সাহেবপাড়ার বাড়ি হলেও তল্লাটটার তেমন একটা সুনাম নেই। প্রেসটিজ কম। বাড়ির সামনের দরজা থেকেই দেখা যায় একটা আস্তাবল। মাঝখানে উঠোন। চারপাশে বড় বড় ছাউনি। সাহেবদের জুড়িগাড়ি থাকত সেখানে। এখন থাকে নানা মডেলের মোটর গাড়ি। দুটো বড় গ্যারেজ নিজের নামে ভাড়া নিয়েছে নারায়ণী। একটায় রাখে নিজের গাড়ি ভারী মোটর সাইকেল আর একটা স্কুটার। আর একটা গ্যারেজ এতদিন খালিই ফেলে রেখেছিল। দিন সাতেক ধরে নানারকম জিনিস ঢোকাচ্ছে তার ভেতরে। নিশুতি রাতে শুধু নিশাচরদের সাক্ষী রেখে অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তু দিয়ে ভরাট করছে গ্যারেজটাকে। গাড়ির সঙ্গে এসব জিনিসের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।
অন্ধকার যেন এই বাড়িটাকে ভালবাসে। তাই রাত নামলেই অন্ধকারে গা-ঢাকা দেয়—মিলেমিশে অদৃশ্য হয়ে যায়। অদৃশ্য এই আলয়ে অশরীরীর মতই ঘুর ঘুর করে নারায়ণী। উদ্ভট সামগ্রীগুলোকে বয়ে নিয়ে এসে রাখে দোসরা গ্যারেজটায়। সেই সময়ে পেচক-চক্ষু নিয়ে কেউ যদি তার কাণ্ডকারখানা দেখত নিশ্চয় ভাবত—মাথায় ছিট আছে নারায়ণীর।
আর পাঁচটা মানুষের মত সে স্বাভাবিক নয়—সুতরাং তাকে একসেনট্রিক বলা যায় অনায়াসেই। নারায়ণী নিজেও তা জানে। কিন্তু দুনিয়ার কারও তোয়াক্কা রাখে না। দুনিয়ার কেউও ওর খবর রাখে না। তাই ওর নৈশ-অভিযানের কাণ্ডকারখানা দেখতেও কেউ ওৎ পেতে বসে থাকে না।
যদি থাকত তাহলেও নারায়ণীকে চিনতে পারত কিনা সন্দেহ। টিপটপ ড্রেস পরে গাড়ি হাঁকিয়ে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে যেত নারায়ণী—বেনেপুকুরের একটা গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে রেখে যখন বেরিয়ে আসত, তখন আর তাকে ছিমছাম তরুণী বলা যেত না। বোরখাপরা একটি মেয়ে মুসলমান পাড়ার

অলিগলি মাড়িয়ে ঢুকে পড়ত বস্তিবাড়ির লাগোয়া একটা লাল টালি দিয়ে ছাওয়া একতলা বাড়িতে। একখানাই ঘর সে বাড়িতে এবং আকার আয়তনে আণুবীক্ষণিক। অর্থাৎ অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখার উপযুক্ত।
দুনিয়া বেগম নামে একটি মেয়ের নামে ভাড়া নেওয়া আছে এই ঘরটি। এইমাত্র যে বোরখাধারী ঢুকল ঘরে, দুনিয়া তারই নাম। সকাল হলেই ঘর থেকে বেরিয়ে বাসে চেপে দুনিয়া চলে যায় বড়বাজারে। হাবিজাবি জিনিস কেনে। বাসে অথবা ট্রামে চেপে ফিরে আসে। সাহেবপাড়ার দোসরা আস্তাবলে জিনিসগুলো ঢুকিয়ে রেখে চলে আসে বেনেপুকুরের আস্তানায়। কিছুক্ষণ পরেই টিপটপ ড্রেসে নারায়ণী গাড়ি হাঁকিয়ে ঢোকে নিজের গ্যারেজে। এত হুঁশিয়ার না হলেও চলে বিরাট এই কলকাতায়—কিন্তু তবুও কোথাও ত্রুটি রাখতে চায় না নারায়ণী। সব কাজেই বড় খুঁতখুঁতে। বড় নিটপিটে।
বেনেপুকুরে ছোট্ট ঘর, দোসরা গ্যারেজ, দুনিয়া বেগম চরিত্রে সৃষ্টি,এই যে এত আয়োজন তা কিন্তু অকারণে নয়। ঠোঁটের কোণে যে দুর্মর বাঁকা হাসি নিয়ে নিখুঁতভাবে প্রতিটি কাজ এতদিন ধরে করে এসেছে নারায়ণী—তার উদ্দেশ্যে ছিল একটাই। একদিনেই কাজে লেগে গেল এত আয়োজন। সেইদিন এক দ্যুতিময় তীব্রতা দেখা দিয়েছিল নারায়ণীর কপিশ চোখে। নীল-পীত বর্ণের চোখ। বানরের গায়েই দেখা যায় এমনি রঙ। চাপা আনন্দে ঝিক্ ঝিক্ করে উঠেছিল আশ্চর্য রঙের দুই নয়ন।
সেদিনও ভোরের রোদ রঙীন ধনুক-জানলা দিয়ে মায়াময় ছায়া বিস্তার করেছিল টানা লম্বা ঘরটায়। সেজেগুজে আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়ে বাঁকা ছুরির হাসি হেসেছিল এই কাহিনীর শরীরী বিদ্যুৎ।সেদিন তার দুই চোখে ইলেকট্রিক রোশনাই দেখা দিয়েছিল। পরনে ছিল গলাখোলা চেক সার্ট আর ব্লুজিনস্-এর ট্রাউজার্স। মণিবন্ধে সোনার চেনে পাতলা সোনার ঘড়ি। হিপপকেটে সোনার সিগারেট কেস।
এত ভোরে নারায়ণী ওঠে না। কিন্তু আজ এই অপার্থিব সময়ে তাকে শয্যা ত্যাগ করতে হয়েছে। গ্যারেজ থেকে নিজের ঝিলমিলে প্রিমিয়ার পদ্মিনী বের করেছে। তারপর হু-উ-উ-ম করে উধাও হয়ে গেছে বেনেপুকুরের দিকে।
একটু পরেই একটা প্রাগৈতিহাসিক ভ্যান গাড়ি এসে ঢুকলো আস্তাবল গ্যারেজে। দুনিয়া বেগম নেমে এল ড্রাইভারের সিট থেকে। দুনিয়া আজ বোরখা বর্জন করে সালোয়ার কামিজ পরেছে। ওড়না দিয়ে মাথায় ঘোমটা রচনা করেছে এবং গলা আর বুক জড়িয়ে রেখেছে। ধবধবে সাদা মুখ আজ অনেক কালচে। মেয়েরা প্রসাধন লাগিয়ে ফর্সা হতে চায়। দুনিয়া হয়েছে কালো। কেউ যেন গায়ের রঙ দেখেও চিনতে না পারে। তাই হাতের তেলকালি দুগালেও ঘষে নেয়। চাবি ঘুরিয়ে খোলে গ্যারেজের দরজা। ভ্যানগাড়ির সিটে উঠে বসে গাড়ি চালিয়ে ঢুকিয়ে নেয় গ্যারেজের ভেতরে। নেমে এসে দরজা বন্ধ করে দেয় ভেতর থেকে।
সবুজ ভ্যানগাড়িটার দুপাশে ইংরেজীতে সাদা অক্ষরে লেখা "বিশ্বকর্মা বিস্কুট"। খুব পাকা হাতের লেখা যদিও নয়, তবে দিশি বিস্কুট কোম্পানীর ভ্যানগাড়ি বলেই চোখে লাগে না। গাড়ির অবস্থাও সেইরকম। বডি পিটিয়ে পিটিয়ে হাতে রঙকরা।
আস্তাবল-গ্যারেজে এখন গাড়ি ধোওয়া-মোছার সময়। এক-একজনকে তিনটে চারটে গাড়ি ধুতে হয়। জনা পাঁচেক ছোকরা হাতের কাজ ফেলে চেয়েছিল সবুজ ভ্যান আর তসা আরোহিণী মুসলিম মেয়েটির দিকে। কিন্তু এত কাছ থেকে দেখেও চিনতে পারেনি। চোখ দেখেই তো মানুষ চেনা যায়। চতুরা দুনিয়া সে গুড়েও বালি দিয়েছে। চোখে কনট্যাক্ট লেন্স লাগিয়েছে। তাই তার কালো হরিণ চোখ দেখে হতভম্ব হয়েছে গাড়ি ধোনেওয়ালা।
এরকম সাড়া যে পড়বেই, দুনিয়া তা জানে। তোয়াক্কা করেনি। কেননা, পরিকল্পনা মাফিক যেভাবে কাজ এগোচ্ছে—'দুনিয়া' অদৃশ্য হয়ে যাবে দুনিয়া থেকে আর একটু পরেই।
গ্যারেজের আলো জ্বালিয়ে নিল দুনিয়া। মাথা আর গলার ওড়না খুলে রাখল গাড়ির মধ্যে। খুলে ফেলল ভ্যানের পেছনের দরজা। ভেতরে থরে থরে সাজানো অনেকগুলো কাঠের প্যাকিংবাক্স। একটা একটা করে নামিয়ে রাখল মেঝের ওপর। গ্যারেজের এক কোণ থেকে নিয়ে এল একটা বাটালি আর একটা কাঠের হাতুড়ি। চাড় মেরে মেরে খুলতে লাগল একটার পর একটা বাক্স—ভেতরকার বস্তাগুলোকে টেনে আনল বাইরে।
প্রত্যেকটা বাক্সে রয়েছে দু-ডজন করে চীনে মাটির জার, কাঠের কুচো, খড় আর কাগজের ফালি দিয়ে প্যাককরা।
সবকটা বাক্স খালি হওয়ার পর দুনিয়া ওরফে নারায়ণী আলোর তলায় নিয়ে গেল একটার পর একটা জার এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চুলচেরা দেখে গেল সর্বাঙ্গ। চোখে এখন শিল্পীর তন্ময়তা। কিন্তু সে যে শুধু শিল্পকর্মে তারিফ করার জন্যে ভোররাত থেকে উঠেই এত কাণ্ড করছে না, তা বোঝা গেল যখন বিশেষ একটা প্যাকিং বাক্সের দু-ডজন চীনে মাটির জারকে সরিয়ে রাখল আলাদা করে। প্রত্যেকটা জারের গায়ে খুব সূক্ষ্মভাবে একটা ক্রশ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে ফুল-লতা-পাতা কারুকাজের ফাঁকে। অন্য বাক্সগুলোর কোনো জারেই নেই এই নিগূঢ় সঙ্কেত।
হৃষ্ট হয়েছে দুনিয়া বেগম ওরফে নারায়ণী গোয়েন্দানী। এত কাণ্ডকারখানা করেছিল এই কদিন ধরে শুধু এই প্রত্যাশায় যা খুঁজছিল, তা পেয়েছে। দুডজন চিহ্নিত জার।
শুধু এই জার কখানাই তার দরকার। তারপরেই শূন্যে মিলিয়ে যাবে 'দুনিয়া' চরিত্র —আসরে নামবে নারায়ণী অভিনব গোয়েন্দানী নারায়ণী। চিহ্নহীন জারগুলোকে কাঠের বাক্সে তুলে ডালা এঁটে দিল দুনিয়া। দেখলে এখন মনে হবে না, খোলা হয়েছিল প্রত্যেকটা বাক্স চিলের ছোঁ মারার মতলব নিয়ে। এরপর শুরু হল আসল কাজ। চিহ্নিত জারগুলোর ঢাকনা খুলে ভেতরের সাদা পাউডার উপুড় করে ঢেলে নিল একটা বালতির মধ্যে।
গ্যারেজের আর এক কোণে তাগাড় করা ছিল অনেকগুলো খালি টিনের কৌটো। শূন্য গহ্বর জারগুলোর প্রত্যেকটায় একটা করে টিনের কৌটো ঢুকিয়ে চারদিকে কাঠ, খড়, কাগজ গুঁজে প্যাক করে দিল টিপে টিপে, যাতে ঝাঁকুনি পেলেও যেন নেচে উঠে বাজনা শুরু করে না দেয়।
কৌটোভরা জারগুলোকে এবার সাজালো বিশেষ সেই প্যাকিং বাক্সে। স্তরে স্তরে সাজানোর পর একদম ওপরে রাখল একটা খাম। এই সেই দামী কাগজের ভারী লেফাপা—যার মধ্যে একটা মাত্র কাগজ এবং সেই কাগজে টানা লাইনে আঁকা আছে বিচিত্র এক নাচিয়ে নারীমূর্তি। অভিনব গোয়েন্দানী নারায়ণীর ভিজিটিং কার্ড।
এরপর কাঠের ডালা এঁটে পেরেক ঠুকে দিল নিখুঁতভাবে।
মাত্র দেড় ঘণ্টায় সব কাজ শেষ, সবকটা বাক্স ঢোকালো ভ্যানের ভেতরে। দুহাট করে খুলে দিল গ্যারেজের পাল্লা। এই দেড় ঘণ্টায় বেশ কিছু গাড়ি ধোওয়া মোছা হয়ে গেছে। তিনটে ছোকরা ভাগলবা হয়েছে। বাকি দুজন ভিজে ন্যাকড়া হাতে নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল রূপসী দুনিয়ার দিকে। রূপসী সে তো বটেই। রঙখানাকে মেটে রঙের করে ফেলার জন্যে রূপ আরও বেড়েছে। যেন একটা কালো চুম্বক হয়ে গেছে। ওড়না দিয়ে গলা আর মাথা ঢেকে নিয়েছে গ্যারেজের দরজা খোলবার আগেই। কাজেই তার কালো হরিণ চোখের দামিনী ঝলক দেখেও ছোঁড়া দুটো চিনতেও পারল না যে, এই সেই জ্যান্ত বিদ্যুৎ—ঝিলমিলে সাদা প্রিমিয়ার পদ্মিনী যার পরমপ্রিয় বাহন।
চারটে বিহ্বল চক্ষু বিহ্বলতর হল 'বিশ্বকর্মা বিস্কুট' কোম্পানির তোবড়ানো সবুজ ভ্যান হু-উ-উ-স করে উধাও হয়ে যেতেই। এক গাদা কালো ধোঁয়া যেন ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিয়ে গেল বিস্ফারিত চারখানা চোখ আর দুখানা নোংরা নাকের ওপর। ওরা অবশ্য চিক্কুর মেরেছিল তারপরেই—গ্যারেজের দরজা যে খোলা রইল গো!
কিন্তু কালো দুনিয়া নিশ্চয় কালা হয়ে গেছিল

সেই মুহূর্তে। অথবা শুনেও শোনেনি কানে। ছেলে দুটো তখন ঢুকে পড়েছিল খোলা গ্যারেজে। দেখেছিল মেঝেতে ছড়ানো বিস্তর কাঠ, খড় আর কাগজের কুচোর পাশে গড়াগড়ি যাচ্ছে বাটালি, কাঠের হাতুড়ি আর খান তিনেক খালি টিনের কৌটো।
দেখতে পায়নি কেবল বালতিটা। তোবড়ানো সবুজ ভ্যানে তা উঠে গেছে। রয়েছে দুনিয়ার পায়ের কাছে।
ছোঁড়ার দল দুনিয়াকে আর কখনো দেখেনি। পৃথিবীর কেউই আর দেখেনি।
'বিশ্বকর্মা বিস্কুট' কোম্পানীর মার্কামারা গাড়িখানা আধখানা শহরের রাস্তা কাঁপিয়ে পৌঁছোলো প্রাক্তন চীনেপাড়ার একটা অতীব নোংরাগলিতে। ঠিকানা মিলিয়ে ডেলিভারী দেওয়া হল সবকটা প্যাকিংবাক্স। রসিদ নিয়ে নারায়ণী ওরফে দুনিয়া চলে গেল বড়বাজারে। গাড়ি দাঁড় করালো একটা প্রাইভেট হসপিট্যালের সামনে। বিলেতফেরত ডাক্তাররা এখানে মনের আনন্দে রুগী হত্যা করে। চীফ মেডিক্যাল অফিসার একজন খাণ্ডারণী মহিলা। শুধু তাঁরই ভয়ে এখনও পাইকারী হারে হত্যা শুরু হয়নি। দুনিয়া বালতি হাতে সটান ঢুকে গেল তাঁর চেম্বারে। খটাং করে বালতি রাখল টেবিলের ওপর। চোখ রাঙিয়ে তাকালেন খাণ্ডারণী সি এম ও। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না করে দুনিয়া বললে—চুনোপুঁটি থেকে রুই-কাতলা—অনেকেই ধরা পড়বে যদি এই বালতিখানা লালবাজারে মহেশ ঘোষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। খুব সাবধানে নিয়ে যাবেন—এর যা দাম—তত টাকা সারাজীবনেও রোজগার করতে পারবেন না। যদি জিজ্ঞেস করে কোত্থেকে পেলেন, তখন দেখাবেন এই খামটা : বলেই নিজের 'ভিজিটিং কার্ড' বালতিভর্তি সাদা গুঁড়োর মধ্যে গুঁজে দিয়ে নিমেষে হাওয়া হয়ে গেল দুনিয়া। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে যখন মুখের হাঁ বন্ধ করলেন খাণ্ডারনি প্রধান ডাক্তার—দুনিয়া বেগমের পক্ষীরাজ ভ্যানগাড়ি তখন নক্ষত্রবেগে ছুটছে চিৎপুর রোডের দিকে।
বড় কাজগুলো সব শেষ। এবার একটা ছোট্ট কাজ বাকি। গাড়ি চলে এল শহরের বাইরে। বড় রাস্তার ধারে একটা জংলা জায়গায় ভ্যান ঢুকিয়ে দিয়ে শিস দিতে দিতে নেমে এল দুনিয়া। একটিন রঙ আর বুরুশ বের করল পেছনের দরজা খুলে, প্রবল বেগে বুরুশ চালনা করে ঢেকে দিল 'বিশ্বকর্মা বিস্কুট' লেখাটা। [illegible] কালঘাম ছুটে গেছিল ধরে ধরে [illegible]—হরফের ছাঁদগুলো আহামরি হয়নি, [illegible] এখন বুরুশের দাপটে অদৃশ্য হয়ে [illegible] লেখা। আগাগোড়া সবুজ [illegible] দুপাশ।
[illegible], সবুজ ভ্যান নাচতে [illegible] কলকাতার দিকে। পথের ধুলো পাকসাট খেয়ে আছড়ে পড়ছে কাঁচা রঙে। কিছুক্ষণ পরেই আর বোঝাও গেল না যে সদ্য রঙ মারা হয়েছে দুপাশে। ঠিক যে রকম অবস্থায় ভ্যানভাড়া নিয়েছিল দুনিয়া—ফিরে এসেছে সেই অবস্থা।
মৌলালির মোড়ে লিটিল গ্যারেজে আর্তনাদ করে ঢুকে পড়ল ধুলো ঢাকা যন্ত্রযান। বোদে আর হুলো হাসিমুখে বেরিয়ে এল অফিসঘর ছেড়ে। বিরাট এই গ্যারেজের মালিক এই দুই ভাই। বত্রিশখানা গাড়ি ভাড়া খাটিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বাঙালিরাও ট্রান্সপোর্ট বিজনেস করতে জানে।
মুচকি হেসে একতাড়া নোট এগিয়ে দিল ব্ল্যাকবিউটি।
বোদে একগাল হেসে বললে—"চা খেয়ে যান।"
হুলো বললে —"ট্রাবল দেয়নি তো?"
কালো কনট্যাক্ট লেন্সের হরিণী চাউনি দিয়ে দুজনকে দুখানা বাণ মেরে বেগে বেরিয়ে এল দুনিয়া। ট্যাক্সি চেপে ফিরে এল বেনেপুকুরে। তারও একটু পরে হেলে দুলে চার্মি চেহারায় নারায়ণী উঠে বসল নিজের প্রিমিয়ার পদ্মিনীতে।

॥তিন॥

সুরজিৎ জানাও বাঙালি। অবাঙালিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে-ও দুরন্ত ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছে। চৌরঙ্গীপাড়াতেই বড় রাস্তার ধারে তার আলট্রা-মডার্ন নাইটক্লাবের নাম জেনে গেছে শহরের নাইট-লাভাররা। আরও একটা শৌখিন ব্যবসা জমিয়েছে পার্কস্ট্রিটে। হাই-রাইজ বিল্ডিং-এর তলায় মস্ত দোকান। মেয়েদের মুখের চেকনাই ফেরাতে যা-যা দরকার, সবই পাওয়া যায় এই দোকানে। পারফিউম থেকে পাউডার, রুজ থেকে ক্রীম—যা চাইবেন, সব পাবেন। দিশি, বিলিতি—সমস্ত।
সুরজিৎ জানা সবাইকে বলে বেড়ায় বটে, এই দুখানা বিজনেসের দৌলতেই তার যা কিছু রমরমা—কথাটা আদৌ সত্যি নয়। মদ আর সেন্ট বেচে কতটুকুই বা মুনাফা থাকে? তাই 'ফরাসী ল্যাভেন্ডার ক্রীম' নামে এক কৌটো বস্তু তাকে রোজই বেচতে হয় গণ্ডায় গণ্ডায়। যারা কেনে, তারা ল্যাভেন্ডার সুবাসের জন্যে লালায়িত নয়, ক্রীম পেলেও কুপোকাৎ হয় না। কৌটোর মধ্যে চালান হয় অন্য উপকরণ। দামও চড়া। পাঁচখানা একশ টাকার নোট বের করে দিতে কিন্তু হাত কাঁপে না বিশেষ এই কৌটোলোভী মানুষগুলোর।
সুরজিৎ জানা এ ব্যবসা একা চালায় না। সে দল গড়তে জানে, দলের প্রত্যেককে পায়ের তলাতেও রাখতে জানে। নিজেও খাটতে পারে অসুরের মত। আকার আয়তনও অসুরপ্রতিম। সবসময়ে হাসছে হারমোনিয়াম-দাঁত বের করে। মোম দিয়ে পাকানো কুচকুচে কালো গোঁফ অদ্ভুতভাবে মানিয়ে গেছে কালো কুচকুচে মুখটায়। ঠোঁটদুটোয় অবশ্য ধবলের ছোঁয়া লাগায় বড় বিকট দেখায় হাসির সময়ে। সুরজিতের তাতে হীনমন্যতা নেই। মাঝে-সিঁথি কাটা তৈলাক্ত চুলে হাত বুলোনো তার মুদ্রাদোষ। আর একটা মুদ্রাদোষ তার আছে। কথায় কথায় বলে ওঠে—"জীবনটাই বিষ!" মোটেই বিষ নয় তার জীবন। বরং বল' যায় খাঁটি অমৃত। এই অমৃত থেকে মাঝে মধ্যে ছিটেফোঁটা বিতরণ করে সমাজ শিরোমনিদের। ফলে, তিনশ বছরের কলকাতার কলজে মুচড়ে ধরে টু-পাইস কামিয়েও সে বিলক্ষণ নিরাপদ। নারায়ণী গোয়েন্দানী যখন শিস দিয়ে গান গাইতে গাইতে প্রিমিয়ার পদ্মিনী হাঁকাচ্ছে, ঠিক তখনি সরীসৃপ বর্মা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ঢুকল সুরজিতের খাস কামরায়। সুরজিৎ তখন চিঠি লিখছিল। মুখ তুলে বললে—"জীবনটাই

বিষ! আস্তে হাঁটতে পারো না?"
তারপরেই কলম নামিয়ে চোখ গোল গোল করে চেয়ে রইল সরীসৃপের স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো বদনখানার দিকে। একটা চোখ ঘিরে কালো কালসিটে আরও কালো হয়েছে—চোখখানা আরও অদৃশ্য হয়েছে।
"জীবনটাই বিষ!" কালো চুলে হাত বুলিয়ে বললে সুরজিৎ—"প্যাঁদানিটা কে দিল বাছাধন?"
হাফ-এ-ডজন বিশেষণ আউড়ে গেল সরীসৃপ—সব কটাই নারায়ণীকে ঘিরে সযত্নে রচনা করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোকে ছাপার অক্ষরে না দেখাই ভালো। গদীআঁটা ঘুরন্ত চেয়ারে হেলে পড়ে চেয়ে রইল সুরজিৎ জানা। ঘর ঠাণ্ডা করার ফুরফুরে যন্ত্র দিব্বি খোশবাই ছাড়ছে। সুরজিৎ কিন্তু এমনভাবে গোঁফ [illegible]

নাক কুঁচকে ফেলেছে যেন দুর্গন্ধে টিকতে পারছে না। ইতিমধ্যে দু-চার কথায় নিজের দুর্গতির কারণটা পেশ করে ফেলেছে শ্রীযুক্ত সরীসৃপ।
"ফগাবগা কথা ছাড়!" গর্জে ওঠে সুরজিৎ—"মেরে দিল্-টা কে, তা জেনেছিস?" একটা দাঁত নর্দমাতেই গেছে বলে, কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছিল সরীসৃপের। ঠোঁট ফুলে পাঁউরুটি মাথায় ব্যান্ডেজ ল্যাংচাতে হচ্ছে একখানা হাঁটুও জখম হওয়ায়।
"না, বস। সম্রাটও কক্ষনো দেখেনি।"
"ল্যাল্-ল্যাল্ করে ছুটেছিলিস নিশ্চয়? একাই শান্টিং নিয়ে গেল এতজন কে?
"মুগুর মেয়ে, বস্—"
"থাম। জীবনটাই বিষ! —সুজন মস্তানের এরপর। এই নে আমার রসিদ। মাটির মূর্তি বেচে বেচারা খেটে খাচ্ছিল—সে টাকা নিলাম ফেরত দেব বলে—আর তোদের টাকা নিলাম তোদেরই টিট করার জন্যে। এই বলে এই খামটা ছুঁড়ে দিল মুখের ওপর।"
অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে খামটা সরীসৃপের হাত থেকে নিতে নিতে সুরজিৎ বললে—"কত নিয়ে গেল?"
"মোট তিন হাজার।"
"বিসমিল্লা!" বলেই খামটাকে চোখের সামনে আনল সুরজিৎ। আঁতকে উঠল তক্ষুনি। আর একটু হলেই খাম পড়ে যাচ্ছিল হাত থেকে। ভড়কে গিয়ে সরীসৃপ বললে—"কি হল, বস্?"
হাতের খাম তখন টেবিলে শোভা পাচ্ছে আর কোয়ার্টারে। চব্বিশটা জারও পেয়েছে। মার্কা দেওয়া জার। ভেতরে আছে খালি টিনের কৌটো। ওপরে এই ছবি।
"অ্যাঁ!"
"পুরো মাল উধাও!"
"ইয়াআল্লা!" সরীসৃপ কিন্তু খাঁটি হিন্দু। মুখের কথা যখন হারিয়ে ফেলে তখন ঈশ্বরের নাম নেয় এই ভাবে।
"কাল তোদের গেছে তিন হাজার, আর আমার গেল তেরো লাখ। একই পার্টি। কিন্তু কে এই গুল্লী?"
স্ল্যাংস অভিধানে গুল্লী মানে খুবসুরৎ মহিলা। এই মুহূর্তে সে তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে নিজেকে। এখন তার কপিল চোখে মেকী বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল। মহড়া দিচ্ছে পরবর্তী

পার্টি নয় তো?"
"কি বলেন! সুজন লাগবে আমার পেছনে?"
"অ্যামেচার?"
"নো, বস্, নো। ছাতার গুঁতোয় চোয়াল ভেঙে দিয়েছে নাথুরামের, আমার ভেঙেছে হাঁটু, চিক্কুস মাল, বস্। পাক্কা প্রফেশন্যাল, ওটা ছাতা নয়—সোনা বাঁধাই খেঁটে। ঘুরে গেল বন্ বন্ করে—"
"অবাক কলির অবতার, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার" বললে সুরজিৎ—"জীবনটাই বিষ!"
"যাবার সময়ে মারকাটারি কি বলল জানেন?"
আলতো করে মাথায় হাত বুলিয়ে নিল সুরজিৎ। মুখে কথা নেই।
বললে, আজ আর বেশি অয়েলিং করলাম না। মাখাম্বা বডিগুলো তিনটুকরো করে ছাড়ব একখানা খামের পাশে দুটোই দেখতে একরকম। দামী কাগজের লেফাপা।
"জীবনটাই বিষ।" গর গর করে উঠল সুরজিৎ। বলেই খুলল খাম—
ভেতর থেকে বেরোলো নাচিয়ে নারীমূর্তি। পাশের খাম থেকেও টেনে বের করল একই ছবি।
চোখ কপালে তুলে বললে সরীসৃপ—এ যে সেই দশবাই চণ্ডী!
"শুধু নেই দশটা হাত!" শ্বাপদ-গর্জন ছেড়ে বললে সুরজিৎ—লাগল বলে গজ-কচ্ছপের লড়াই!...
"মা—মানে?
মণিপুর থেকে এক লট মাল আজ পেয়েছি। মমতাজ ডেলিভারি নিয়েছে নানকিং অভিযানের জন্যে। প্যাঁচ কষছে মনে মনে। তালপাতার সেপাই সরীসৃপ এবং কালোমোষ সুরজিৎ অবশ্য এখনও তা জানে না। তাই দাঁত কিড়মিড় করে বললে সুরজিৎ "টিকটিকি নয় তো?"
সব টিকটিকি গিরগিটিই তো আপনার মুঠোয়।
"তবে সে কে?"

সাহেবপাড়ার দোতলার মুকুরে ঝলসে উঠল তার ঝকঝকে হাসি।

সুরজিতের মুঠো যত বড়ই হোক, কলকাতার সব টিকটিকিকে কব্জায় রাখতে পারেনি। নারায়ণী তা জানত। তাই টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে চাইল শ্রীধর মণ্ডলকে। তারপর

কথাবার্তা হল এইভাবে :
"শ্রীধর মণ্ডল ?"
"বলছি।"
"প্রোমোশন চান ?"
"মানে ?"
"বড়পোস্টে উঠতে চান ?"
"কে আপনি ?"
হাসির ঝঙ্কার ভেসে এল টেলিফোনের মধ্যে—"আপনার বন্ধু। কলকাতার বুকেই কোকেন পাচার হচ্ছে—ধরতে চান ?"
"চাই।"
"আজ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসের সামনে দাঁড়াবেন। 'পারফিউম মনার্ক' দোকান থেকে বেরোবে একজন ইয়ংম্যান। বয়স তিরিশের বেশি নয়। রঙ কালো। মোটা গোঁফ। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। একটা স্কুটারে উঠবে। রেড কালার, ওল্ড মডেল ভেসপা, নাম্বার **WBM 9688**,তাকে থানায় নিয়ে গেলেই পকেটে পাবেন প্যাকেট। থ্যাংকিউ।" লাইন কেটে গেল।
কপাল কুঁচকে রিসিভার নামিয়ে রাখল শ্রীধর মণ্ডল। হাতঘড়ি দেখল। কাঁটা পাঁচটার ঘরে।

কাঁটায় কাঁটায় সাতটার সময়ে 'পারফিউম মনার্ক' থেকে বেরিয়ে এল প্রদীপ চক্রবর্তী। রাস্তা পেরিয়ে স্কুটারের লকে চাবি লাগাতেই হাত পড়ল কাঁধে। সচমকে ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখল শ্রীধর মণ্ডলকে। প্লেন ড্রেসের পুলিশ অফিসার। মুখে দ্যাখন হাসি। ফলে, ঝিকঝিক করছে সোনা বাঁধানো দাঁতটা। শিকারী গোঁফজোড়া খাড়া হয়ে গেছে শিকারকে বগলদাবা করতে পেরে। একহাতে উঁচিয়ে রয়েছে নিজের আইডেনটিটি কার্ড।
বললে ঘ্যাসঘেসে গলায়—"কাইন্ডলি থানায় চলুন।"

কেন ? গোখরোর মতই ফ্যাঁস করে উঠেছিল প্রদীপ চক্রবর্তী, সোনা-দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেই ছেড়ে দিল শ্রীধর মণ্ডল। মুখের হাসি এখন অদৃশ্য।
বললে—চা খেতে।...
ঠিক এই সময়ে সশব্দে একটা বুলেট বাইক ব্রেক কষল প্রদীপের গা ঘেঁষে। আর একটু হলেই প্রদীপকে নিয়েই আছড়ে পড়ত। ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল প্রদীপ। চালক একজন শিখ তরুণ। দৈত্যো হাসি হেসে নীরবে ক্ষমা চেয়ে নিয়েই উল্কা বেগে সাড়ে তিন হর্স পাওয়ারের বাইক হাঁকিয়ে মিশে গেল যানবাহনের ভীড়ে।
প্রদীপের স্কুটারে চেপেই থানায় এল শ্রীধর মণ্ডল। কিন্তু মিনিট দশেক পরেই বললে কাষ্ঠ হেসে—স্যরি।
বিমূঢ়মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল প্রদীপ। হিপপকেট থেকে ক্ষুদে প্যাকেটটা ভ্যানিশ হয়ে গেল কীভাবে, নিজেই বুঝতে পারছে না। তাই কথা না বাড়িয়েই বেরিয়ে এল থানা থেকে।
পরের দিন।
কৃস্ট্যাল গেলাসে হুইস্কি ঢেলে এগিয়ে দিল নারায়ণী। বললে—"খান।"
অপরূপার নীল-হলুদ আশ্চর্য চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল প্রদীপ চক্রবর্তী। সুনয়না মেয়ে সে অনেক দেখেছে, কিন্তু এরকম মাদকতা কোনো চোখে দেখেনি। মাদকতা রয়েছে মেয়েটির সারা দেহে। অথচ আচরণ তার সংযত। বরং একটু কড়া-ই বলা চলে।
হাত বাড়িয়ে গেলাস নিয়ে বললে আড়ষ্ট গলায় "আপনিই আজ ফোন করেছিলেন ?"
"হ্যাঁ।"
"দেখা করতে চেয়েছেন কেন ?"

আপনি দেখা করতে এসেছেন কেন ?
নারায়ণীর কণ্ঠে কি কোনো ঝঙ্কারই নেই ? কথা আটকে গেল প্রদীপের। কপিল চোখ বুঝি এক্সরে চোখ হয়ে তার মনের ভেতর পর্যন্ত দেখছে। চোখ নামিয়ে নিয়ে গেলাসে চুমুক দিল ধাতস্থ হওয়ার জন্যে। তারপর—
"প্যাকেটটা ফিরে পাওয়ার জন্যে।"
"এই কি সেই প্যাকেট ?" রাজস্থানী ব্যাগ থেকে একটা রাংতায় মোড়া পুঁচকে প্যাকেট বের করে টেবিলে রাখল নারায়ণী।
ঢোক গিলল প্রদীপ—"হ্যাঁ। আপনি পেলেন কি করে ?"
নারায়ণীর কণ্ঠে এবার ফুটল জলতরঙ্গ হাসি—"শিখ মোটর সাইক্লিস্ট দিয়ে গেল।"
চোখ বড় হয়ে গেল প্রদীপের—"ওইটুকু সময়ের মধ্যেই ?"
"বড় পকেট মার হতে পারত।"
"আমার ধন্যবাদটা তাকে জানাবেন।"
"পিকপকেটিং না করলে অবস্থা কাহিল করে ছাড়ত থানায়।"
"ধন্যবাদটা আমাকেই জানান।"
"তার মানে ?"
"আমিই সেই শিখ তরুণ।"
"আপনি !"
"হ্যাঁ, প্রদীপবাবু। আমিই সেই। আরও অনেকরূপ আছে আমার—দেখবেন যথাসময়ে। আপনাকে ডেকেছি আমার সাগরেদি করার জন্যে।"
"কিন্তু আপনি কে ?"
"আমি ? খুব সাধারণ মেয়ে বলে মনে হচ্ছে কী ?"
"না।"
"আমার নাম নারায়ণী। একসময়ে মামুলি মেয়েই ছিলাম—এখন আর নয়। গত কয়েক বছরের ঝড়ঝাপটায় আমি হয়েছি অন্য মেয়ে। সমাজকে কলুষমুক্ত করাই আমার ব্রত। সমাজের দুষ্ট ব্রণ টিপে খতম করে দেওয়াই আমার সাধনা—আর কিচ্ছু নয়। আমি মামুলি জীবনযাপন করতে পারি না—হাঁপিয়ে উঠি। ঝুঁকি ছাড়া চলতে পারি না—মরে গেছি মনে হয়। আমি চাই অ্যাডভেঞ্চার। পদে পদে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জাকষা, বিপদের ডংকা শুনলেই সেই দিকে যাই ধেয়ে—আমি নারায়ণী—অভিনব গোয়েন্দানী নারায়ণী, নারায়ণী সেনা আমার মূল শক্তি...প্রদীপবাবু, আপনাকেও আহ্বান জানাচ্ছি—হবেন আর একজন নারায়ণী সেনা ?"
বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল প্রদীপ। অকস্মাৎ চেহারা পালটে গেছে নারায়ণীর। ফুলে ফুলে উঠছে নাকের পাটা। কুলিশ কঠোর হয়ে উঠেছে পিঙ্গলচক্ষু। এই বুঝি বিদ্যুৎবহ্নি ঠিকরে আসবে চোখের তারা থেকে।
"আ-আমি ?"
"প্রদীপ চক্রবর্তী, আপনার গত দু-পুরুষের সমস্ত খবর আমি জোগাড় করেছি। আপনি বেসিক্যালি ডিজঅনেস্ট নন। অসৎ পথে এসেছেন অভাবের তাড়নায়। আপনার রক্তে খারাপ পদার্থ নেই—কিন্তু পাকেচক্রে আপনি কোকেন পাচার করছেন—সুরজিৎ জানার হাতের পুতুল হয়ে গেছেন। রঞ্জনা কি তা জানে ?"
"র-রঞ্জনা ?"
"গেলাসটা শেষ করুন। ফাইন। আবার ঢালুন। হ্যাঁ, রঞ্জনা। আপনার সুইটহার্ট রঞ্জনা। যাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। বারো বছর বয়স থেকে যার প্রাণের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছেন। আপনি কি চান রঞ্জনা জানুক কি ঘৃণিত পথে আপনি পয়সা রোজগার করছেন ?"
ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল প্রদীপ। হাত কাঁপছে থির থির করে।
"ভয় নেই" করাল কণ্ঠস্বরে বলে গেল নারায়ণী—"এ ঘর থেকে বাইরে আওয়াজ যায় না। আর আমি যা জানি—তা আমার নারায়ণী সেনা-রা ছাড়া আর কেউ জানে না। রঞ্জনা এখনও জানে না আপনার কুকীর্তি—আমিও জানাতে চাই না—আপনার নোংরা টাকাতেই তো তার পড়াশুনো এগোচ্ছে।"
গলা শুকিয়ে গেছিল প্রদীপের। এক চুমুকে শেষ করে দিল গেলাস। হাতের কাঁপুনি একটু কমেছে। তবে মাথাটা যেন ফেটে যাচ্ছে।
নারায়ণীর কপিল চোখের তারা এখন বর্শার ফলার মত সূচাগ্র। কণ্ঠে বাজছে ডমরু—আমি আপনার মঙ্গল চাই,, প্রদীপবাবু, এটা কি ঠিক যে, এম- এ পাশ করেও চাকরি না পেয়ে যখন দোরে দোরে লাথিঝাঁটা খাচ্ছিলেন—তখন অফার এসেছিল সুরজিতের তরফ থেকে ?"
"হ্যাঁ," গলাবুজে এসেছে প্রদীপের।
"আপনার মত স্মার্ট গাই-কেই দরকার ছিল। চেহারার চেকনাই আর বোলচালে তুখোড়

থাকলেই একাজে 'সেফ' থাকা যায় । আপনি টোপ গিলেছিলেন ।"
"উপায়ও ছিল না ।"
"এখন কেটে বেরিয়ে আসতে চান ?"
হাসল প্রদীপ । বড় কষ্টের হাসি—"সুরজিৎ জানার দলে ঢোকা যায়—বেরোনো যয় না ।"
"বডিফেলে দেবে ?"
"রঞ্জনার বাবার বাড়িটাও বন্ধক রেখেছে এক কথায় । নগদে দিয়েছে তিন লাখ । সেই টাকায় বিয়ে হয়েছে রঞ্জনার তিন দিদির । এখন ফের সেই ফকির । পথে বসাবে আমি দল ছাড়লেই—ছাড়া যদিও যাবে না ।"
"কিন্তু আমি যে আপনাকে ছাড়াবো ।"
আপনি !
কীভাবে ?
"এইভাবে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নারায়ণী। আজ তার পরনে ল্যাভেন্ডার রঙের শাড়ি আর ব্লাউজ । সাদা গলায় সরু সোনার চেনে ঝুলছে এক টুকরো হীরে । হীরের রোশনাইও অবশ্য ম্লান হয়ে গেছে তার চোখের রোশনাই-এর কাছে। বাংতামোড়া প্যাকেটটা নিয়ে গেল ঘরের ওয়াশ বেসিনের কলের তলায় । প্যাকেট খুলে সমস্ত সাদা গুঁড়ো জলে ধুইয়ে বের করে দিয়ে এসে বসল চেয়ারে ।
বললে—ঠিক এইভাবে । আপনার বিরুদ্ধে দামী প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করলাম যেভাবে ঠিক সেইভাবে সুরজিতের বিরুদ্ধে দামী প্রমাণগুলো এতক্ষণে পৌঁছে গেছে লালবাজারে ।
মণিপুরের চীনেমাটির জারগুলো ? প্রদীপের আবিল চোখও এবার চমকে ওঠে ।
"ইয়েস মিস্টার চক্রবর্তী । এটা গেল পয়লা নম্বর অ্যাকশন । আরও অ্যাকশনের জন্যে দরকার আপনাকে ।"
"কিন্তু কীভাবে ?"
"আগে বলুন আপনি রাজী ?"
"রাজী ।'
"তাহলে শুনুন, সুরজিতের দলে রাখতে চাই আমার লোক ।"
"আমিই হব সেই লোক ?"
"[illegible], পারবেন না ?"
"[illegible]রব, কি করতে হবে ?"
"শুনুন ।'
[illegible] ড্রিমিড্রিমি কণ্ঠস্বরকে আচমকা খাদে [illegible]য়ে এনে একটানা বেশ কয়েকটা কথা বলে [illegible] নারায়ণী । নিখুঁত একটা ছক । কিন্তু দুর্ধর্ষ [illegible]
[illegible]স্থির হয়ে গেল প্রদীপের—এ আপনি কি [illegible] একী সম্ভব ?
[illegible] মধ্যে এঁকেবেঁকে ইলেকট্রিসিটি খেলে [illegible] চোখে । চাপা তীক্ষ্ণ গলায় বললে [illegible]—ভয় পাচ্ছেন ?
[illegible] ভয় পায় না, তার আবার কিসের [illegible]
[illegible] ভয় পাই না, প্রদীপবাবু । তাই আমারও নেই ভয় । কিন্তু সমাজের বুকে বসে যারা তিল তিল করে পচিয়ে দিচ্ছে সমাজকে অট্টহেসে নৃত্য করে চলেছে গরিবের বুকে পা দিয়ে কেষ্টবিষ্টুকে কব্জায় রেখে,নরক গুলজারে মত্ত রয়েছে নিজেরা আপনি কি চান না তারা সবংশে নিধন হোক ।
চাই, চাই, চাই । হাঁপাচ্ছে প্রদীপ । নিদারুণ ওই চাহনির হলকা আর সহ্য করতে পারছে না ।
তবে ভরসা রাখুন আমার ওপর—আমার নারায়ণী সেনার ওপর । আপনিও আজ থেকে একজন সেনানী ।
আমার মত আর ক'জন আছে আপনার ?
দুর্জ্ঞেয় হাসি ভেসে গেল নারায়ণীর অজন্তাঅধরের ওপর দিয়ে ।
অনেক । জানবেন এবং দেখবেন যথাসময়ে । কমরেড আমাদের সবার লক্ষ্য একটাই—স্বয়ং নারায়ণী আমাদের সহায় । সর্ষের মধ্যে যখন ভূত ঢুকে পড়ে, তখন সেই সর্ষেপোড়া দিয়ে ভূত তাড়ানো যায় না । প্রদীপবাবু যুগে যুগে তাই আবির্ভাব ঘটে নারায়ণী সেনাদের মত অকুতোভয় কিছু মানুষের । তিনশ বছরের পাপের কলকাতার পাঁক সাফ করতে এসেছি আমরা । হাতে হাত মেলান ।
হাত বাড়িয়ে দিল নারায়ণী । স্খলিতচরণে উঠে দাঁড়িয়ে সেই হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল প্রদীপ চক্রবর্তী । সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য এক শিহরণ সঞ্চারিত হয়ে গেল তার অণুপরমাণুতে । বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইল অদ্ভুত ব্যক্তিত্বময়ী নারায়ণীর মুখপানে । এ মুখ জুড়ে এখন ভাসছে বেপরোয়া হাসি । কপিল চোখের তারায় ঝিকঝিক করে জ্বলছে ভয়ঙ্কর দ্যুতিময় তীব্রতা । দুরন্ত রক্তের আভায় টুকটুক করছে লাল ঠোঁট । শেষ কথাগুলো কিন্তু বলেছে বড় সুন্দর করে । সুরেলা মধুরতার ধ্বনি বেজেছে রিমঝিম করে । রিমঝিম করছে প্রদীপের মাথাও । তিনকড়ি দত্তর ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়েছে ছেলেবেলাতেই । বুদ্ধিশুদ্ধি তার কম, শিক্ষাদীক্ষাও নেই । চেহারায় হোঁতকা ফুটবল, মাথাজোড়া টাক ।
সুরজিৎ জানা এক আঁচড়েই বুঝে নিয়েছিল তাকে । প্রোপ্রাইটর বানিয়েছিল নাইট ক্লাবের । তিনকড়ি বেঁচে গেছিল । এই যোগ্যতায় এমন কাজ সে কোথায় পাবে ? মাস গেলে বাঁধা মাইনে, মাথামোটা দু-একটা পুলিশ অফিসার ঝামেলা করলে দিন কয়েকের জন্যে হাজতবাসের দরুন হপ্তার বাড়তি হাজার টাকা ফাউ । এ যে রাজার চাকরি ।
নাইট ক্লাবের সামনের ঘরে মদ গেলার ব্যবস্থা । ঘরময় টেবিল আর চেয়ার । একধারে বার কাউন্টার । তার পাশে টেবিলে বসে থাকে থপথপে তিনকড়ি । ক্লাবের অ্যাকটিভিটি শুরু হয় সন্ধ্যা ছটায় । ভিড় জমে দশটায় । চলে ভোর রাত পর্যন্ত । তিনকড়ি একবারও হাই তোলেনা পুরো সময় ডিউটি দিয়েও । কত মজার মজার জিনিস দেখতে পায় । হাই আসবে কি করে ?
তিনকড়ির টেবিলের পাশে দেওয়ালের গায়ে পাশাপাশি দুটো লাল পর্দা ঝোলে । দুই পর্দার মাঝে একটা সাদা পাথরের স্ট্যাচু । দশ ফুট উঁচু । নিশ্চয় কোনো রাজবাড়ি থেকে নিলামে কেনা—অথবা চোরাই জিনিস । ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সেন্ট্রাল হলে এমন নিখুঁত প্রস্তরমূর্তি দেখা যায় । এ মূর্তিটি একজন বিবশা নারীর । এক হাতে স্খলিত আঁচল খামচে আর এক হাত ব্যাকুলভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে । এই মূর্তির বাঁ পাশের পর্দা সরালে টয়লেট । ডান পাশের পর্দা সরালে দেখা যায় নিরেট দেওয়াল । কারুকাজ করা মেট্যাল প্লেটের টালি দিয়ে ঢাকা মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত ।
তিনকড়ির একটা বড় কাজ নিজের টেবিলের তলায় রাখা একটা বোতাম টিপে মেট্যাল দেওয়াল সরিয়ে দেওয়া । বিশেষ যুগলের কাছ থেকে পয়সাকড়ি নেওয়ার পর বোতাম টিপতে হয় তাকে ? আদিম ক্ষুধায় আতপ্ত নর-নারী এগিয়ে গিয়ে লাল পর্দা সরালেই দেখে চিচিং-ফাঁক হয়ে গেছে ধাতুর দেওয়াল । সামনে চাতাল । সেখান থেকে একথাক সিঁড়ি উঠেছে ওপরদিকে । আর এক থাক সিঁড়ি নেমেছে নিচের দিকে । ওপরে উঠে গেলে একটা বড় ঘর । খুব নিচু হাইটের । কোনমতে মাথা খাড়া করে দাঁড়ানো যায় । অনেকগুলো টেবিল আর চেয়ার । সুরাপানের ব্যবস্থা এখানেও আছে । আছে জুড়ি নাচের আয়োজন, আর আছে নিষিদ্ধ জুয়ার ব্যবস্থা । সবচেয়ে বড় ব্যবস্থাগুলো রয়েছে বড় ঘরের তিনদিকে । প্রতিদিকে পর পর চারটে খুপরি ঘর । মোট বারোটি ঘর । প্রতিটি ঘরের দরজা বৈদ্যুতিক বোতাম টিপে খুলতে হয় এবং বন্ধ করতে হয় । দরজার মাথায় লাল-হলুদ-সবুজ আলো । ঘরে যখন লোক থাকে তখন জ্বলে লাল আলো । ঘর দখলের মেয়াদ ফুরিয়ে এলেই জ্বলে ওঠে হলুদ আলো । ঘর খালি থাকলে জ্বলে সবুজ বাতি । তখন সবুজ বাতির মধ্যে দিয়ে দেখা যায় দুটি শব্দ —সিক্রেট লাভ ।
আলোগুলো কখনো কখনো অপারেট করে সুরজিৎ জানা নিজে । মেট্যাল দরজার সামনে থেকেই যে সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে, তার শেষ ধাপের সামনে আর একটা মেট্যাল দরজা । এ দরজার চাবি থাকে শুধু সুরজিতের কাছে । ঘরে বসে সে বারোটা ক্লোজড সার্কিট টিভির সুইচ অন করে দেয় । ওপরের বারোটা ঘরে অবৈধপ্রেমের দৃশ্য উপভোগ করে । কষ্টিকালো মুখের ধবললাঞ্ছিত ঠোঁটজোড়ার জন্যে কোনো উচক্কাছুঁড়িও তার বাহুবদ্ধ হতে নারাজ । তাই দেখেই আশমেটায় । এতেই তার পরম সুখ । বিকৃত বাসনার তৃপ্তি । সবুজ আলো জ্বালিয়ে ঘর খালি করে দেওয়ার ভারটাও মাঝে মাঝে সে নেয় নিজের

ঘাড়ে—অন্য সময়ে ছেড়ে দেয় তিনকড়ির ওপর।
রাত দশটা বাজে। প্রদীপ চক্রবর্তী হন হন করে এসে দাঁড়ালো তিনকড়ির সামনে। তিনকড়ির উপরি রোজগার ইদানীং কমে গেছে বলে গুম হয়ে বসেছিল। সুরজিৎ যেন অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে। ফলে অনেকদিন হাজতবাস করা হয়নি তিনকড়ির। সুরজিতের ওপর চাপা ক্ষোভ এই কারণেই।
প্রদীপের মুখের দিকে তাকিয়ে মাংসল চোখের পাতা দুটোকে বার দুয়েক ওপর নিচ করল তিনকড়ি। প্রদীপ যেন বড় চঞ্চল। বড় অস্থির।
সুরজিৎবাবু এসেছেন ? প্রদীপের স্খলিত প্রশ্ন। এত তাড়াতাড়ি কখনো আসেন ? তিনকড়ির জবাব।
তাহলে আমি ভেতরে বসছি—এলেই বলবেন, আমি এসেছি—জরুরি কথা আছে।
বাড়তি কথা বলা তিনকড়ির ধাতে নেই। টেবিলের তলায় হাত চালিয়ে টিপে দিল বোতাম। বলল—যান।
লাল পর্দা সরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল প্রদীপ। টেবিলে বসে গেল ছোট্ট একটা হুইস্কি নিয়ে।
একটু পরেই এল সুরজিৎ। তারও মুখ গম্ভীর। ধবলা ঠোঁটদুটো চাপা রাগে শক্ত পাথর হয়ে রয়েছে। প্রদীপকে ডেকে নিয়ে ঢুকল নিচের তলার স্পেশাল চেম্বারে। মুখোমুখি বসে বললে—কি ব্যাপার ?
প্রদীপ বললে—আমার রোজগারটা বাড়াতে চাই।
আরও ? গলার সুরে ভোজালি খেলিয়ে বললে সুরজিৎ,ছিলে তো উপোস করে—
আমি কৃতজ্ঞ সে জন্যে। মাপ করবেন। কথাটা অন্যভাবে পাড়া উচিত ছিল। আপনার আরও কাজে লাগতে চাই। তাহলেই তো আমার দু-পয়সা আয় বাড়বে।
"তা ঠিক,"সুর নরম হল সুরজিতের—"প্ল্যানটা কী ?"
"নাইট ক্লাবে শাঁসালো পার্টি ডেকে আনতে চাই।"
"খুব ভালো। আমাদের রেট কিন্তু চড়া। ঘণ্টায় দুশ।"
"জানি। আমাকে দেবেন টোয়েন্টি পারসেন্ট।"
"টোয়েন্টি ?"
"ঘণ্টায় কুড়ি। সারারাতে হরেদরে দেড়শ। মাসে সাড়ে চার হাজার।"
"হঠাৎ এত টাকার দরকার কেন ? বিয়ের মতলব আছে বুঝি ?"
"হ্যাঁ, আগে টাকা কামাই, একটা ফ্ল্যাট কিনি—তারপর।"
"গুড। ঠিক আছে। দেব টোয়েন্টি পারসেণ্ট। আনো মক্কেল।"
ঘড়ি দেখল প্রদীপ—এক ঘণ্টার মধ্যেই আসবে একজন।
সুরজিতের ধবলসাদা ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক হয়ে গেল—"জীবনটাই বিষ। আমাকে না জানিয়েই ইনভাইট করেছো ?"
"আমি জানতাম আপনি রাজী হবেন আমার টার্মস-এ। নাহলেও নাইট ক্লাবে আসবে ফুর্তি করতে—ক্ষতি কী ? বিলেতে ছিল এত বছর—দেখতে চায় কলকাতার নাইট ক্লাব।"
"কোন দেশ থেকে ?"
"ক্যালিফোর্নিয়া থেকে। মেয়েটি কিন্তু বাঙালি। জন্মেছে আফ্রিকায়। পড়েছে লন্ডনে। এখন দেখতে চায় কলকাতা।"
"মেয়ে ?"
"হ্যাঁ। টেরিফিক বিউটি। আপনি শুধু তিনকড়িকে বলেদিন, একটি মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেই যেন পাঠিয়ে দেয় এখানে।"

ইণ্টারকমে তিনকড়িকে হুকুম দিয়ে সুরজিৎ বললে—"জীবনটাই বিষ ! চলো, ওপরে গিয়ে বসা যাক। রঞ্জনাকে একদিন নিয়ে এসো।"
'এখানে কেন ?' মুখ শুকিয়ে যায় প্রদীপের। হেসে ওঠে সুরজিৎ। কালো মুখের সাদা ঠোঁটের বিদ্যুৎ ঝলসানি শিহরিত করে তোলে প্রদীপকে—"আলাপ করব বলে।" বিড়বিড় করে বলে তারপর—"জীবনটাই বিষ।"
দোতলার ঘরে টেবিলে বসে প্রদীপ সবে দুটো পেগ শেষ করেছে এমন সময়ে খুট খুট করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল যেন সোফিয়া লোরেন। পাথরে খোদাই চলমান ইটালিয়ান বিউটি। ধবধবে সাদা মুখ, টকটকে লাল ঠোঁট। ঝকঝকে নীল চোখ, কুচকুচে কালো চুল বুকখোলা হলুদ জ্যাকেট অর্ধেক অবারিত করে রেখেছে উদ্বেল বক্ষশোভাকে। টাইট ব্লুজিন্স হাঁসফাঁস করছে ছটফটে নিতম্ব দুটোকে ধরে রাখতে গিয়ে।
ট্যারা হয়ে গেল সুরজিৎ। চট করে হাত বুলিয়ে নিজের চুলে, গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়িয়ে প্রদীপ বললে আসুন। ইনিই সুরজিৎ জানা। আর ইনি—
লাল নখগুলো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে গলার মধ্যে বেহালা বাজিয়ে বললে টেরিফিক বিউটি—মিস নারায়ণী।
গ্ল্যাড টু মিট য়ু, সুন্দরীর করমর্দন করতে গিয়ে কীরকম যেন হয়ে গেল সুরজিৎ। নারীস্পর্শ চিরকালই তাকে বিচলিত করে। নারী দর্শনেই তার পরম সুখ।
মিস নারায়ণী বললে—তিনটে কন্টিনেন্ট চষে ফেলেছি। উচ্চারণ শুনেই বুঝছেন। বাংলাটা তেমন আসে না। দেখতে এলাম ক্যালকাটার তিনশ বছরের ফেস্টিভ্যাল। আর আপনাকে।
আমাকে। যেন চমকে ওঠে সুরজিৎ। এটা তার অভিনয়—"জীবনটাই বিষ ! কি আছে আমার মধ্যে ?"
প্রতিভা ! বলে নীল নয়নে নীল বিদ্যুৎ খেলিয়ে বললে নারায়ণী—প্রদীপবাবু, থ্যাংকিউ ফর ইনট্রোডাকশন টু দ্য গ্রেট ভারমিন। আপনি এখন আসতে পারেন।
সুট করে উধাও হয়ে গেল প্রদীপ। এখন তার ডিউটি তিনকড়ির কাছে—মেট্যাল দরজা যেন বন্ধ না হয়।
নিচু হাইটের ঘরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নারায়ণী আর সুরজিৎ। নিমেষমধ্যে এই ইলেকট্রিক ললনা পরিবেশটাকে কর্তৃত্বের মধ্যে এনে ফেলেছে। তার লাল ঠোঁটে ব্যঙ্গ আর তাচ্ছিল্যের লুকোচুরি খেলা। চোখে তীব্র নির্মমতা। হকচকিয়ে গেছে সুরজিৎ। কালো চুলে ঘন ঘন হাত বোলাচ্ছে।
হাতের ইশারায় চেয়ার দেখিয়ে দেয় নারায়ণী। কলের পুতুলের মত আসন গ্রহণ করে কৃষ্ণমূর্তি। শ্বেতসুন্দরী বসে টেবিলের এপাশে। সুরজিতের ইংরেজী জ্ঞান তেমন জোরালো নয়। তবুও 'ভারমিন' শব্দটা বড্ড খচখচ করছে মাথার মধ্যে। ভারমিন মানে কি জঘন্য পোকা ? সুন্দরী নারায়ণী কি তাকে দুষ্ট কীট বলতে চাইছে ?
একটু একটু করে মাথা গরম হতে থাকে সুরজিতের।
চেয়ে আছে নারায়ণী। তাকে এখন নীলচক্ষু বাঘিনী বলেই মনে হচ্ছে।
কাষ্ঠ হেসে সুরজিৎ বললে—আপনি একা ?
হ্যাঁ একা। এক্কেবারে একা। কেন বলুন তো ? ওই ঘরগুলো দেখেছেন ?
যাদের সামনে লেখা রয়েছে 'সিক্রেট লাভার' ?
হ্যাঁ। ওখানে একা ঢোকা যায় না।
হেসে উঠল নারায়ণী। এসরাজের সবকটা তারে যেন একই সঙ্গে আঙুলের টান পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আসুন···
যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়িয়ে বেকুব গলায় বললে সুরজিৎ,কোথায় ?
সিক্রেট লাভার ঘরে।
আমাকে নিয়ে ?
মাই ডিয়ার আগলি ভারমিন, আপনাকে পালিশ করার জন্যেই আমার আগমন।
হোয়াট ডু ইউ মীন।
দেখেছেন এই খামটা ? রাজস্থানী ব্যাগের মধ্যে থেকে একটা সাদা লেফাপা বের করে বললে নারায়ণী—এর আগেও দুবার দেখেছেন—চৈতন্য হয়নি। সরীসৃপকে ঠেঙিয়ে হুঁশিয়ার করেছি—আপনার কিন্তু শিক্ষা হয়নি তাই এলাম।
বনের মোষ যখন ক্ষেপে যায় তখন তার মত ভয়ঙ্কর জীব আর হয় না। লাল হয়ে যায় সুরজিতের দুচোখ। ফুলে ওঠে রগের শির
"আপনি !"
ইয়েস, মাই ডিয়ার আগলি ভারমিন, আমিই সেই। যাকে পেলে ছিঁড়ে খাবেন আপনি সব সরীসৃপ—তাই এলাম চলুন, ছিঁড়ে খাবেন

চলুন।

আপনি। দাঁত কড়মড় করছে সুরজিতের। ব্রেনটা এত স্লো কেন, ভারমিনমশায় ? বুঝতে এত দেরি হচ্ছে কেন ? ছিঁড়ে খাবার আগে একটা জিনিস জেনে রাখুন—আপনার মত যেকটা পোকা এই শহরটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে—তাদের প্রত্যেককে টিপে টিপে মারবার জন্যেই আমার আবির্ভাব। আমি আইন রাখি নিজে কিন্তু আইন মানি না। আমি কানুন মেনে চলা গোয়েন্দা নই—আমি কানুন ভাঙার গোয়েন্দানী। আমি পুলিশ-ফুলিশ কাউকে পরোয়া করি না—আমি দেখি শুধু সাধারণ মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য। আমি জানি সর্ষের মধ্যে কোন কোন ভূতকে ধরে রেখেছেন আপনি—এটাও জানি যে এই কলকাতায় এমন দুঁদে ওঝা আছে যাদের নাগাল এখনো পাননি। সেই রকমই জনাকয়েক আসবে এখুনি—এতক্ষণে এসে গেছে আপনার পারফিউম মনার্ক কোকেনের আড্ডায়।

গনগনে চোখে টেবিলের ওপর হাত রাখে সুরজিৎ।

বিদ্রূপ বেজে ওঠে নারায়ণীর রণরণে স্বরে। বোতাম টিপছেন ? চ্যালা চামুণ্ডা ডাকছেন ? ডাকুন। লাশ ফেলবেন আমার ? চেষ্টা করে দেখুন। আপনার মত পোকামাকড়দের পিটিয়ে কলকাতা ছাড়ার ক্ষমতা নিয়েই আমি এসেছি। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না—কেউ না।

দুপদাপ আওয়াজ শোনা গেল সিঁড়িতে। উঠে এসেছে চারজন ষণ্ডামার্কা ওয়েটার। পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে যমদূতের মত। পালাবার পথ নেই।

হাসির সুরে টিটকিরি দিয়ে ওঠে নারায়ণী—"সাবাস। অবলাকে খতম করার জন্যে এতজনকে তলব করার কি দরকার ছিল ? ভালই হল। চ্যালাচামুণ্ডাদেরও পিটুনি খাওয়া দরকার। নইলে খবরটা ছড়াবে কি করে ? দাঁড়াও হনুমান দল ! একটু ধূমপান করেনিই।"

কথা বলতে বলতেই রাজস্থানী ব্যাগ থেকে সুদৃশ্য ছাতা বের করে টেবিলে রেখেছিল নারায়ণী। সব কটা ওয়েটারের লুব্ধ দৃষ্টি এখন ছাতার সোনার বাঁটটার দিকে। হিপপকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস বের করে ফুট করে খুলে একটা সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে নিয়েছে নারায়ণী। গ্যাস লাইটারের ফ্লেম তাতে লাগানোও হয়ে গেছে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সিগারেটটা দু আঙুলে নিয়ে আচমকা ছুঁড়ে দিলে ওয়েটারদের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল সিগারেট। তাল তাল সাদা ধোঁয়া নিমেষে ছিটকে গেল ঘরের চারদিকে। একইসঙ্গে সোনার বাঁটের ছাতা হাতে তুলে নিয়েছে নারায়ণী। একটানে ভেতর থেকে টেনে এনেছে একটা গুপ্তি। সাদা ধোঁয়ার যবনিকা ভেদ করে শব্দভেদী গুপ্তি চালাচ্ছে আগুয়ান পায়ের শব্দ লক্ষ্য করে। অনেকগুলো আর্তনাদের মধ্যে 'জীবনটাই বিষ!' শব্দ দুটো ধ্বনিত হচ্ছে বার বার···

একঘণ্টা পরে পুলিশের লোক এসে পেয়েছিল কোকেন কারবারের সমস্ত ডকুমেন্ট আর ক্ষতবিক্ষত পাঁচটা দেহ। কারোরই কলজে ফুটো হয়নি—কিন্তু পঙ্গু অথবা অঙ্গহীন হয়ে থাকতে হবে প্রত্যেককেই। কারও নাক নেই, কারও নেই একটা কান, কেউ হয়েছে কানা, কেউ খোঁড়া, সুরজিৎকে বোধহয় শুয়েই কাটাতে হবে বাকি জীবন,তার শিরদাঁড়াটাই গেছে ভেঙে।

ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেছে নারায়ণী। যাবার সময়ে নিয়ে গেছে সুরজিতের পকেট থেকে একটা চাবি। চাবি দিয়ে খুজছে নিচের তলায় তার নিজস্ব চেম্বার। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নগদে নিয়ে গেছে সুটকেশ সমেত···

এ হিসেব শুধু সুরজিতের। পুলিশ এখনও জানেনি···

সেই দিনই গভীর রাতে কড়া নড়ে উঠল বেলেঘাটার চাউলপট্টি রোডের খালপাড়ের একটা বাড়িতে। একতলা জরাজীর্ণ বাড়ি। খালের ওপার থেকে ভেসে আসছে চামড়ার গন্ধ। এপারে শামুক পোড়ানোর দুর্গন্ধ।

এ বাড়িতে থাকে শুধু একজন প্রৌঢ়। নাম তার থাকগে— নামের দরকার নেই এই কাহিনীতে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এসে দরজা খুলেছিল সে। কিন্তু কাউকে দেখতে পায়নি। পায়ের কাছে সরু রোয়াকে পড়েছিল শুধু একটা সাদা খাম।

ল্যাম্পপোস্টের আলোয় খাম খুলে দেখেছিল প্রৌঢ়। একটা সাদা কাগজে এক লাইনে আঁকা একটা নাচিয়ে নারীমূর্তি। তলায় একই নাচের ঢঙে লেখা :

জামাইবাবু,

দেখা হবে ঠিক সময়ে। টাকার অভাবে দিদির চিকিৎসা করতে পারেননি। রেখে গেলাম এক লক্ষ টাকা। আপনি যাদের ওপর হোমিও ডাক্তারি করেন—তাদের ভাল যাতে হয় সে ভার আপনার।

নারায়ণী।

এই রাতেই আরও দুটি প্রাণী চিরতরে ছেড়ে গেল শহর কলকাতা। তাদের একজন রঞ্জনা। আর একজন প্রদীপ চক্রবর্তী। রঞ্জনার সিঁথির সিঁদুরের বয়স মোটে একঘণ্টা।

চল্লিশ লক্ষ টাকা জমা পড়ল একটা নামী সেবা প্রতিষ্ঠানে।

দুঃখিত। নামটা বলা যাবে না।

বাকি টাকা ? সে তো নারায়ণীর কমিশন ! ♣

অলংকরণ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়